ড. এ. কে. এনামুল হক

ক্ষমা চাওয়ার রাজনৈতিক অর্থনীতি

আফ্রিকা নিয়ে ভ্রান্ত ধারণার অন্ত নেই। আফ্রিকার সমস্যাও অনেক আবার সম্পদও অনেক। আমার অনেক সময় মনে হয়, এ সম্পদই পৃথিবীর বহু সমস্যার মূল। একসময় ভারত ও চীন ছিল পৃথিবীর ধনী দেশের অন্যতম। তখন মুদ্রার প্রচলন হতে শুরু করে, আইনকানুন, আদালত, এমনকি আমলাতন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল, যা পশ্চিমা দেশে ছিল অকল্পনীয়। পৃথিবীতে চীনই প্রথম ভেবেছে যে রাজ্য শাসন করতে হলে মেধাবী প্রশাসক নিয়োগ করা দরকার। নিজের পরিবারের লোকজন দিয়ে ভালোভাবে রাজ্য শাসন করা যায় না। চালু করে দেয় মেধা যাচাই করে আমলা নিয়োগের নীতি। কয়েকশ বছর পর ব্রিটিশরা ভারত শাসন করতে গিয়ে তার মর্ম বুঝতে পারে। তাই বলা হয়, ব্রিটিশ রাজ্যে মেধাভিত্তিক আমলা নিয়োগ প্রথম চালু হয় ভারতে। আইসিএস পরীক্ষার আগে ব্রিটিশরা কখনো ভাবেনি মেধার ভিত্তিতে আমলা বা শাসক নিয়োগ করতে হবে। তখন চালু ছিল একটি সহজ নীতি—রাজার ইচ্ছা কিংবা প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা। যার ছিটেফোঁটা পৃথিবীর বহু দেশে এখনো আছে। ব্রিটিশ মন্ত্রিপরিষদে একজন মন্ত্রী ততদিন পর্যন্ত থাকবেন যতদিন তিনি প্রধানমন্ত্রীর মনঃপূত হবেন। আর আমলারা? তাদের অন্য নাম ইয়েস মিনিস্টার বা জো হুকুম জাঁহাপনা।

তবে আজ কথা বলছি আফ্রিকা নিয়ে। আফ্রিকা কি সত্যি সত্যি অন্ধকার মহাদেশ? ওখানে কি কেবলই মারামারি কাটাকাটি? সোনা, রুপা, হীরা, তামা, তেলসহ এত সব খনি থাকা সত্ত্বেও এ মহাদেশ কেন এত গরিব, তা নিয়ে একটি ভাবনা আমার মনে ছিল। আমার আফ্রিকার বন্ধু কিংবা আফ্রিকার ছাত্রছাত্রী, যাদের সঙ্গেই দেখা হয়েছে তাদের কাউকে কখনই 'অসামাজিক' কিংবা 'গাধা' মনে হয়নি। তবে তাদের এ অবস্থা একবিংশ শতাব্দীতেও থাকবে কেন? অনেকের মনেই কেন জানি আফ্রিকা নিয়ে নেতিবাচক মনোভাব রয়েছে, যা আমার ধারণা তৈরি করেছে আমাদের ঔপনিবেশিক শিক্ষা। কারণ পশ্চিমা দেশগুলো কখনই আফ্রিকানদের মানুষ মনে করেনি। শুরুতে তারা তাদের মনে করত বানর। জাল দিয়ে বানরের পালকে যেভাবে ধরা হয়, তেমনি করে পর্তুগিজ, স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ কিংবা ব্রিটিশরা বানর ধরা কৌশলে আফ্রিকার মানুষকে ধরে চালান দিত ইউরোপ ও আমেরিকায় ক্রীতদাস হিসেবে। অ্যালেক্স হেলির রুটস পড়লে তাই মনে হবে। অনেকটা বন থেকে পাখি ধরে ঢাকার কাঁটাবনে বিক্রি করার মতো। এ পাখির যেমন থাকে না নিজস্ব কোনো প্রাণ, তেমনি তার মৃত্যুতে কোনো পোস্টমর্টেম হয় না। পোষা পাখি মারা গেলে অপরাধ হবে কেন? আমি তো তাকে ভালোভাবেই লালন করেছি, মরে গেছে। ঠিক তেমনি ক্রীতদাস মারা গেলেও একই ব্যবস্থা ছিল। ক্রীতদাসের মৃত্যু কখনই পুলিশের খাতায় উঠত না, যেমনটি রাস্তার কুকুর বা পোষা গাভীটি মারা গেলেও পুলিশের খাতায় তার নাম থাকে না। এ দাস প্রথা যে পর্তুগিজদের আবিষ্কার তা নয়। দাস প্রথার বিরুদ্ধে মানুষের মতামত তুলে ধরার জন্যই ইসলাম ধর্মে হজরত বেলালের কথা আসে। ১ হাজার ৪০০ বছর আগে তাকে দিয়েই মুসলিমদের মধ্যে বর্ণবাদবিরোধী চেতনা প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তবে তা ধোপে টেকেনি বহু দেশেই। ঔপনিবেশিক শাসন তাদের শেষ পর্যন্ত ফিরিয়ে নিয়েছে সেই বর্ণবাদের দিকেই।

আফ্রিকায় দাস তৈরির 'খনি' প্রতিষ্ঠা করার পর ইউরোপের দিগন্ত খুলে যায়। বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমিক পাওয়ায় তারা হয় ক্ষমতাবান। তাদের উৎপাদনক্ষমতা ও মুনাফা বেড়ে যায়। তাদের মাথায় প্রথম প্রশ্ন আসে, কোথায় তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করা যায়? স্বাভাবিকভাবে আফ্রিকায় নয়! কারণ ওখানে তো তাদের মতে মানুষই নেই। তাই তাদের খোঁজ চলে পূর্বদিগন্তে। ভারতবর্ষ ও চীনে। তাদের সমস্যা ছিল মাঝপথে। ভারত কিংবা চীন আসার রাস্তা তখন অটোমান বা ওসমানীয়দের দখলে। ওসমানীয়রা তখন একে একে দখল করছিল পশ্চিমা দেশগুলো। রাজারা তখন তটস্থ। কী করে ওসমানীয়দের মোকাবেলা করা যায়? অন্যদিকে বিভাজিত ইউরোপ তা করতেও পারছিল না। তার ওপর ছিল মঙ্গলীয়-চীনাদের আক্রমণ। প্রায় হাঙ্গেরি পর্যন্ত তাদের আক্রমণ বিস্তৃত ছিল। ছিল পারস্য সাম্রাজ্য। চীন, ওসমানীয় ও পারস্য সাম্রাজ্যের যন্ত্রণায় স্থলপথে চীন কিংবা ভারতে গিয়ে পণ্য বিক্রি করা ছিল প্রায় অসম্ভব। তাই ইউরোপ গোটা আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করে নৌপথে শেষ পর্যন্ত ভারতে আসে। তবে এখানে তারা জাল দিয়ে ভারতীয়দের ধরে বিক্রি করার মতো দুঃসাহস দেখায়নি। এখানে তাদের মূল লক্ষ্য ছিল বাণিজ্য। তাই তারা মোগল ও স্থানীয় রাজাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়। মোগলদের সবচেয়ে দুর্বল দিক ছিল নৌপথ। তারাও দেখল সমুদ্রপথে শত্রুর মোকাবেলার জন্য পশ্চিমাদের সহায়তা খারাপ নয়। তাই তাদের বাণিজ্য চুক্তির মূলমন্ত্র ছিল বাণিজ্য অধিকারের বিনিময়ে নৌপথ জলদস্যুমুক্ত রাখা। এভাবেই পর্তুগিজ, স্পেন, ফ্রান্স ও ব্রিটিশরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘাঁটি স্থাপন করে। এসব বাণিজ্য সৃষ্টির মূলে ছিল যেসব নাবিক, তাদেরকে ইউরোপীয় রাজারা দিয়েছেন স্বীকৃতি। কেউ হয়েছেন স্যার, কেউ হয়েছেন ডিউক ইত্যাদি।

তাদের কাজ ছিল রাজার নামে পৃথিবীর যেকোনো দেশে হানা দেয়া, দখল করা, মণিমুক্তা সংগ্রহ করা এবং ব্যবসা করা। মণিমুক্তা সংগ্রহ করে রাজকোষে জমা দিয়ে অনেকেই পেয়েছেন খেতাব কিংবা রাজ্য পরিচালনার ক্ষমতা। পশ্চিমা বিশ্বের এ মনোভাব এখনো সচল। তাই দেখবেন নৌপথে তাদের দাপট অব্যাহত। তারা তাদের নিজেদের স্বার্থে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে ঘাঁটি তৈরি করে সেই দেশের ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়। যা আইনে এখনো সিদ্ধ। যদি একা তা না করা যায়, তবে সংঘবদ্ধভাবে তা করা হয়। তাই দেখবেন, পশ্চিমা বিশ্ব নানা অজুহাতে থাকে সংঘবদ্ধ। দক্ষিণ চীন সাগর কিংবা কৃষ্ণ সাগর, যেখানেই তাকাবেন দেখবেন একটি সংঘবদ্ধ শক্তির প্রকাশ।

বলছিলাম আফ্রিকার দাস প্রথার কথা। দাস প্রথাকে ভিত্তি করে তারা আমেরিকা আবিষ্কার করেছে, দখল করেছে। আমেরিকার আদিবাসীদের হত্যা করেছে। তাদের সম্পদ লুট করেছে। তাদের ধর্ম বিনষ্ট করেছে। তাদের ভাষা ধ্বংস করেছে। শুধু তাই নয়, খোদ আমেরিকাবাসীদের নাকের ডগায় বসে কলোম্বাস বলেছে যে আমরা তোমাদের আবিষ্কার করলাম। হাস্যরস বা কৌতুকের একটি সীমা রয়েছে। আপনি আমার বাসায় এসে বললেন, আমাকে আবিষ্কার করেছেন। ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা তাই পড়েছি কিংবা জেনেছি। আমাদের শিক্ষকরা একবারের জন্য বলেননি যে এমন মিথ্যাচার অধর্ম। মানুষকে মানুষ আবিষ্কার করে না। মায়া সভ্যতা কিংবা ইনকা সভ্যতার সবকিছু ধ্বংস করে, তাদের মানুষ করার নামে ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি বিনষ্ট করে আজ আমেরিকা দাঁড়িয়ে আছে স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, ফ্রেঞ্চ ও ইংলিশ ভাষায়। আমেরিকা আবিষ্কারের ২০০ বছরের মধ্যে প্রায় এক মিলিয়ন আমেরিকাবাসীকে হত্যা করেছিল তারা। ইতিহাস তার অনেকটাই মনে রাখেনি; বরং তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে বলা হয়েছে তাদের সভ্যতা, তাদের সংস্কৃতি কিংবা তাদের ধর্ম অন্ধকারাচ্ছন্ন। অন্ধকার জগতের। আমেরিকা আবিষ্কারের পর চলে লুটতন্ত্র। ইউরোপ সোনা, রুপাসহ সব প্রকার মূল্যবান সামগ্রী লুট করে জমা দেয় তাদের রাজ কোষাগারে আর সেই নাবিকরা স্বীকৃত হন ইতিহাসের নায়ক হিসেবে। আফ্রিকার ভাগ্যও একই রকম। দাস ব্যবসায় তাদের দোসর হয় আফ্রিকার অনেক উপজাতির প্রধান। দাস একটি শক্তি। তাই পশ্চিমারা আফ্রিকাকে বিভক্ত করে তাদের রাজ্য হিসেবে। এখান থেকে দাস সংগ্রহ করে রাজাদের হাত শক্ত করাই লক্ষ্য। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় উপজাতির প্রধানরা। দোসর তৈরি হয়। তাদেরই মাধ্যমে চলে হত্যাযজ্ঞ। শুধু মানুষ হত্যা নয়; আফ্রিকার ধর্ম, জাতিত্ব, ভাষা ও সংস্কৃতি হত্যা করা হয়। তৈরি হয় বিরোধ। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। চলে আঞ্চলিক যুদ্ধ বিগ্রহ। আর তার মদদ তারাই দেয়। এ মহাদেশেও আমেরিকার মতো প্রতিষ্ঠিত হয় ইউরোপীয় ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি। চলে লুটপাট। হীরা উৎপাদিত হয় আফ্রিকায়, তবে হীরা কাটার যন্ত্রটি থেকে যায় বেলজিয়ামে। বেলজিয়ামে হয় হীরার বাজার। সম্পদ আহরণ ক্রমে বেড়েই চলে। চলে নতুন নতুন দেশ ধ্বংসের খেলা। যেখানেই যাও দখল করো। ইউরোপীয় রাজার শাসন প্রতিষ্ঠা করো। তবেই পাবে রাজার স্বীকৃতি। উপাধি। অন্যায় সবই কিন্তু তাতে কী! রাজদের সম্পদ বৃদ্ধি পায়, তাই তাদের স্বীকৃতি দিয়েই চলে হত্যাযজ্ঞ। তবে এশিয়া বেঁচে যায়। কারণ? এশিয়ায় ছিল প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুন। চীনে ছিল বিশাল এবং মেধাবী আমলাগোষ্ঠী। ভারতেও ছিল নীতিমালাসমৃদ্ধ রাজ্য শাসন। তবে তারা ছিল বিভাজিত। ইউরোপীয় নাবিকরা তাই ভারতের বিভিন্ন অংশে অধিকার স্থাপন করেন। এখানে দোসর তৈরি করেন মীরজাফরদের মাধ্যমে। প্রতিষ্ঠা করেন কোম্পানির শাসন। আর চীনে চলে আফিম ব্যবসা। ক্রমে ভারত ও চীন তার বিরোধিতা করে এবং একসময় জোর করে স্বাধীনতা লাভ করে। চীনের ক্ষেত্রে ঘটনাটি কিছুটা ভিন্ন। তবে সেই আলোচনা থাক।

চীনের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় স্বাধীনভাবে খনিজ সম্পদ আহরণ করতে আফ্রিকায় যায়। আগে তারা তা সংগ্রহ করত ইউরোপ বা আমেরিকার কোম্পানির মাধ্যমে। তারা দেখতে পেল আফ্রিকার সম্পদ নিতে গিয়ে যত অর্থই তারা দেবে, তার সবই পাচার হবে ইউরোপে। আর তখন দোষ পড়বে চীনের। তাই তারা বলে, খনিজ সম্পদের বিনিময়ে আমরা তোমাদের দেশে তৈরি করব রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, রেল যোগাযোগ, নগর-বন্দর জাতীয় অবকাঠামো। তাতে তোমাদের দেশ উন্নত হবে। শাসকদের মধ্যে যারা পশ্চিমা শক্তির পুতুল নন, তাদের অনেকেই রাজি হলেন। ১৪০০ সালে ইউরোপের আগমনের পর ২০০০ সাল অর্থাৎ ৬০০ বছরেও যে অসাধ্য সাধন করা যায়নি, চীন তাই তৈরি করে দিল মাত্র ৩০ বছরে

চলে আসি আফ্রিকায়। দাস প্রথা অবলোপনের পরও ঔপনিবেশিক শাসন ও সম্পদ আহরণ অব্যাহত থাকে। একসময় আফ্রিকার বাণিজ্যিক কেন্দ্রবিন্দু ছিল মোম্বাসা বন্দর। কারণ পূর্ব উপকূল থেকে পৃথিবীর বৃহত্তর অর্থনীতির সঙ্গে অর্থাৎ ভারত ও চীনের সঙ্গে যোগাযোগ করা সহজ ছিল। ইউরোপীয় শাসন তা বদলে দেয়। সমুদ্রবন্দর চলে যায় আটলান্টিকের তীরে। কারণ সেখান থেকে ইউরোপের বাজার কাছে। মোম্বাসা হয় মৃত বন্দর।

এরই মাঝে পৃথিবীর পট পরিবর্তিত হয়। চীনের অর্থনীতি হয়ে ওঠে শক্তিশালী। তার প্রয়োজন খনিজ পদার্থ। তাই তারাও চলে আসে আফ্রিকায়। খনিজ সম্পদ চীনে পাঠাতে গিয়ে তারা বুঝতে পারে বন্দর নেই। অর্থাৎ ভারত মহাসাগর উপকূলে শক্তিশালী সমুদ্রবন্দর নেই। চীন অত্যন্ত দূরদর্শিতার সঙ্গে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। তারা আরো দেখতে পায় খনিজ সম্পদে ভরপুর আফ্রিকায় ব্যবসাবান্ধব অবকাঠামো খুবই অপ্রতুল। নেই রাস্তাঘাট, রেলপথ কিংবা বিদ্যুৎ। গোটা আফ্রিকাই যুদ্ধক্ষেত্র। আফ্রিকার বহু দেশেই রয়েছে স্থানীয় উপজাতিদের আধিপত্য, আর যারাই এসব দেশের রাজা বা প্রধান, তাদের প্রায় সবাই গড়ে তুলেছে সম্পদের পাহাড় ইউরোপ আমেরিকায়। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর যত দেশেই চলেছে অন্যায় শাসন, যেখানেই হয়েছে ক্যু কিংবা রাজার শাসন, তাদের সবাই ইউরোপ, আমেরিকার স্থায়ী বাসিন্দা। তাদের ব্যাংক ব্যালান্স সবই রয়েছে সেসব দেশে, যারা পৃথিবীর সবাইকেই সততা কিংবা ন্যায়নিষ্ঠতার ছবক দেয়। চীন তাই ভাবে কী করে কী করা। চীনের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় স্বাধীনভাবে এসব খনিজ সম্পদ আহরণ করতে আফ্রিকায় এসেছে। আগে তারা তা সংগ্রহ করত ইউরোপ বা আমেরিকার কোম্পানির মাধ্যমে। তারা দেখতে পেল আফ্রিকার সম্পদ নিতে গিয়ে যত অর্থই তারা দেবে, তার সবই পাচার হবে ইউরোপে। আর তখন দোষ পড়বে চীনের। তাই তারা বলে, খনিজ সম্পদের বিনিময়ে আমরা তোমাদের দেশে তৈরি করব রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, রেল যোগাযোগ, নগর-বন্দর জাতীয় অবকাঠামো। তাতে তোমাদের দেশ উন্নত হবে। শাসকদের মধ্যে যারা পশ্চিমা শক্তির পুতুল নন, তাদের অনেকেই রাজি হলেন। ১৪০০ সালে ইউরোপের আগমনের পর ২০০০ সাল অর্থাৎ ৬০০ বছরেও যে অসাধ্য সাধন করা যায়নি, চীন তাই তৈরি করে দিল মাত্র ৩০ বছরে। আমি যখন কেনিয়ায় গেলাম। তাদের রাস্তাঘাট দেখে অবাক হয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম, কখন করলে এ রকম রাস্তা? গর্বের সঙ্গে সে বলল, চীন করে দিয়েছে। আরো বলল, ভালো রাস্তা আর কেউ বানাতে পারে না। চীনারাই পারে। বুঝতে বাকি রইল না শত বছরেও ইউরোপীয় শাসকরা তা তৈরি করেননি। চীন তা করেছে। তবে হ্যাঁ, ব্যতিক্রম কেবল দক্ষিণ আফ্রিকা। কারণ সেখানে ছিল শ্বেতাঙ্গ শাসন, ঔপনিবেশিক শাসন নয় এবং শ্বেতাঙ্গরা তা করেছিল শ্বেতাঙ্গ অঞ্চলেই।

চীনের আধিপত্য আফ্রিকায় বেড়ে যাওয়ায় পশ্চিমারা বিব্রত। কী করে কী হলো? তারা তাদের কৌশল বদলে ফেলল। চলল প্রোপাগান্ডা। প্রায় সব দেশই তাদের রেডিও-টিভিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে প্রয়োজনীয় অনুদান দিল। শুরু হলো সিএনএন, বিবিসিসহ সব আফ্রিকা ফার্স্ট অনুষ্ঠান। হঠাৎ করেই তারা আফ্রিকার জনগণকে বোঝাতে লাগল যে আমাদের চেয়ে ভালো বন্ধু আর কেউ নেই। সরকার বদলের চেষ্টাও চলল সমানতালে। কিন্তু তাতেও কাজ হলো না দেখে শুরু হলো ডুমসডে প্রচারণা। ঋণের ভারে জর্জরিত হবে তোমরা। তোমাদের কুষ্ঠ রোগ হবে! তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাও চীনের ফাঁদ থেকে। টেলিভিশনের পাশাপাশি নানা ইউটিউব চ্যানেলও তৈরি করা হয়েছে। সবার একই প্রচেষ্টা—কী করে চীনকে মানুষের মনে নতুন রাক্ষস হিসেবে তৈরি করা যায়। তার অপরাধ? সে আফ্রিকায় আলো জ্বালিয়েছে। অন্ধকার দূর করেছে। আফ্রিকাকে দেখতে শিখিয়েছে। ওই যে ট্যাক্সি ড্রাইভার, তার মতো শত শত মানুষ ভেবেছে—পশ্চিমারা আমাদের রাস্তাটাও তৈরি করেনি।

তবে থেমে থাকেনি চীনা বাণিজ্য। বেড়েছে উত্তরোত্তর। তাই কৌশল বদলাতে হবে। তারই প্রচেষ্টায় সবাই এখন হুঁশিয়ার। শুধু আফ্রিকা নয়, বিপর্যয় অন্যত্রও দেখা দিতে পারে। দেখা গেল হঠাৎ করেই ক্ষমা চাওয়ার তোড়জোড় বাড়ছে পৃথিবীতে। নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপবাসীদের কাছে ৪০ বছর আগের ডন রেইডের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। কানাডার প্রধানমন্ত্রী মাফ চেয়েছেন তার দেশে আদিবাসীদের সন্তানদের 'মানুষ' করার নাম করে ক্যাথলিক চার্চে নিয়ে এসে হারিয়ে যাওয়ার গল্প ফাঁস হওয়ার ঘটনায়। এ ঘটনা প্রকাশিত হয় নতুন প্রযুক্তির কারণে। স্যাটেলাইট ক্যামেরায় যখন ধরা পড়ল গোপন কবরস্থান। দেখা গেল চার্চের মধ্যেই খুন করা হয়েছে হাজার খানেক শিশুকে। ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী তার দেশের কৃতকর্মের জন্য আফ্রিকার ফরাসি উপনিবেশগুলোর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী নামিবিয়াসহ কয়েকটি জার্মান উপনিবেশের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন এবং বলেছেন আগামী বছরগুলোয় তারা ক্ষতিপূরণ বাবদ ১ বিলিয়ন ডলার সাহায্য দেবেন। এ ক্ষতিপূরণ ক্ষমার সঙ্গে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ব্রিটিশরা ভাবছে। তারা কিছুটা ভীত। তাদের দায় অনেক বেশি। তাদের সঙ্গে আমিও ভাবছি। ক্ষমার এ নতুন জোট কেন? তারা কি তাদের কৃতকর্মের জন্য সত্যিই দুঃখিত, নাকি সবাই চীনের ভয়ে ভীত? চীনকে একঘরে করার এটা কি নতুন কৌশল?

ড. এ. কে. এনামুল হক : অর্থনীতিবিদ ও অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ এবং পরিচালক, এশিয়ান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট